ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

রাজশাহী জেলার পরিচিতি: ভূখণ্ড ও জনগোষ্ঠী (প্রাচীনকাল থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত)

*ড. মোসা. ইয়াসমীন আকতার সারমিন

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলার অন্যতম একটি জেলা রাজশাহী। দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত এ জেলার পাশ দিয়ে নামকরা পদ্মা নদী প্রবাহিত। দক্ষিণে ভারতের মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পূর্বে নাটোর ও উত্তরে নওগাঁ জেলা নিয়ে পরিবেষ্টিত এ জেলার জন্ম ঔপনিবেশিক শাসনামলে হলেও প্রাচীনকাল থেকেই এর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক সূত্র, সরকারি নথিপত্র, সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং পর্যটকদের বিবরণী প্রভৃতির মাধ্যমে এর পরিচিতি ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 'বর্তমান বাংলার উত্তর অংশই অর্থাৎ রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলা পুণ্ড্র জনপদ ভুক্ত ছিল।'[১] ধারণা করা যায় যে, সে সময়ের এই জনপদটি একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়েই ছিল। এই বিশাল ভূখণ্ডটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বংশীয় শাসক শ্রেণির দ্বারা শাসিত হত। যে অঞ্চলটি 'সেন রাজাদের সময় বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিতি লাভ করে সেই অঞ্চলটিকেই বর্তমান রাজশাহী জেলা'[২] বলে ধারণা করা হয়। সেন বংশের অবসান এবং ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলার উত্তরদিকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসন ও ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে 'শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে সাথে এর সীমানাও পরিবর্তিত হয়েছে।'[৩] ইতিহাসের কালপঞ্জি অনুসারে ষষ্ঠদশ শতকের তৃতীয় দশকে ভারতে মোঘল বংশীয় শাসনের সূত্রপাত হয়। এরপর এ অঞ্চল ইংরেজ তথা উপনিবেশিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ দুই শাসনামলে 'পদ্মা নদীর দক্ষিণে নিজ চাকলা রাজশাহী নামে একটি ভূভাগ ছিল এবং ইংরেজ আমলে ঐ চাকলা রাজশাহী নামে উৎপত্তি হয়।'[৪] 'রাজশাহী' শব্দটি সংস্কৃত ও ফার্সি শব্দের মিলিত রূপ। মুসলমান সুলতান 'শাহ' এবং হিন্দু শাসক 'রাজা' হিসেবে পরিচিত। তাই হিন্দু রাজার মুসলমান অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে একে 'রাজশাহী' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৫]

প্রাচীনকাল থেকেই এ ভূখণ্ডটিতে যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। এ কথা সত্য যে, সেই সময়ের জনপদগুলো মূলত সেখানে বসবাসকারী জন গোষ্ঠীর নামানুসারে পরিচিত হত, তদনুযায়ী পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি জনপদে 'পৌণ্ডক' নামক জনগোষ্ঠী বসবাস করতো।[৬] পরবর্তীতে এ অঞ্চলে বহিরাগতদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে বিভিন্ন বংশীয় শাসকদের শাসনামলে এই জনপদের ভৌগোলিক সীমানার যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি জনগণের জীবন ধারাতেও পরিবর্তন এসেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রাচীন কাল থেকে উনিশশতক পর্যন্ত এ জেলার ভূখণ্ড ও জনগোষ্ঠীর ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হল।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

ভূখণ্ড

বর্তমানের রাজশাহী, যা পূর্বে পুণ্ড্র জনপদ নামে পরিচিত, তা ছিল কোমভিত্তিক জনপদ। 'পুণ্ড্র' জনপদও ছিল কোমভিত্তিক জনপদ। বাংলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপি এবং সংস্কৃত গ্রন্থগুলোতে ভিল্ল, মেদ, আভীর, কোল, পৌন্দ্রক (পোদ), পুলিন্দ, ওড্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি পার্বত্য ও ভিন্ন দেশী কোম বা গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে পুণ্ড্রকেরা বা পুণ্ড্ররা সমগ্র উত্তরবঙ্গ জয় করে নেয়। সম্ভবত এ কারণে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন এ পুণ্ড্র কোমের নামের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন জনপদের নামকরণের সম্পর্ক রয়েছে।[৭]

সুপ্রাচীনকাল থেকেই পুণ্ড্র জনপদটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল বলে জানা যায়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে উত্তর ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পুণ্ড্র রাজ্য তখন মৌর্য্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং রাজধানীর নাম হয় পুণ্ড্রবর্ধন[৮]। 'মহাস্থান গড়ে' প্রাপ্ত লিপি থেকে জানা যায় সমগ্র উত্তর বাংলা অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ অঞ্চলের শাসন কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর যা বর্তমানে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত।[৯]

খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে গুপ্ত বংশীয় রাজাগণ ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গুপ্ত আমলে বাংলার অধিকাংশ এলাকাই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সময় কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ভুক্তি(প্রদেশ), বিষয়(জেলা), মণ্ডল, বিথি(গ্রাম) ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত ছিল[১০]। গুপ্ত রাজত্বকালের ভূমিদান বিষয়ক ছয়খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। এসকল তাম্রশাসন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, গুপ্ত আমলে পুণ্ড্রবর্ধন নামক ভুক্তিটি উত্তরাঞ্চলের বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা জুড়ে বিস্তৃত ছিল[১১]। 'গৌড় রাজমালা' এবং 'অশোকাবদান' নামক দুটি গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধন সম্রাট অশোক-এর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলে জানা যায়।[১২]

গুপ্ত আমলে প্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং আনুমানিক ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আসেন। তাঁর বর্ণনায় 'পুন্ন-ফ-তন্ন' নামক যে জনপদের চৈনিক নাম পাওয়া যায় তাই 'পৌণ্ড্রবর্ধন' বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি এই দেশকে সমৃদ্ধশালী, জনবহুল এবং সুন্দর আবহাওয়া সম্পন্ন বলে বর্ণনা করেছেন।[১৩]

শশাঙ্কের রাজত্বের প্রথম দিকে রাঢ়, পুণ্ড্র একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ গৌড় রাজ্য গড়ে উঠে এবং পুণ্ড্রনগর রাজধানী পরিত্যক্ত হয়ে বর্তমান মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপিত হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বৎসর (৬৫০-৭৫০) ধরে বাংলায় মাৎস্যন্যায় অবস্থা বিরাজ করেছিল। শশাঙ্কের গড়া গৌড় রাজ্য থেকে পুণ্ড্র রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[১৪] কারণ অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে শৈলবংশীয় একজন রাজা পুণ্ড্রদেশ জয় করে নেন।[১৫]

'মাৎস্যন্যায়' অবস্থা প্রবল আকার ধারণ করলে এ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য গৌড়ের কতিপয় সামন্ত নায়কেরা একত্রিত হয়ে গোপাল দেব নামে এক ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করেন। এভাবে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাল বংশের সূচনা হয়। শতাব্দীব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পর পাল রাজাগণ নিজেদেরকে সমগ্র বাংলায় একটি সার্বভৌম ও

সুদৃঢ় রাজশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। চার শত বছর পর্যন্ত বাংলায় তাদের এই শাসন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পাল শাসকদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ভূ-ভাগে রাজ্যবিভাগ আগের মতই ভুক্তি, বিষয়, মন্ডল ইত্যাদিতে বিভক্ত থাকে। পৌণ্ড্রবর্ধন তখনও প্রধান ভুক্তি ছিল।[১৬] তবে এ ভুক্তির সীমানা বৃদ্ধি পেয়েছে। খালিমপুরে (Khalimpur) প্রাপ্ত ধর্মপালদেবের (অষ্টম শতক) একটি তাম্র শাসনে ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত ছিল বলে উল্লেখ আছে।[১৭]

খ্রিস্টীয় ৭৫০-১১৬০ শতক পর্যন্ত পাল বংশ রাজত্ব করে। পাল বংশের তিনটি তাম্রলিপি রাজশাহী জেলায় পাওয়া গেছে।[১৮] পাল আমলে বা অষ্টম শতক থেকেই বাংলার অন্যান্য জনপদ ক্রমশ একে অন্যের ভিতর বিলুপ্ত হয়ে পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ জনপদ প্রধান হয়ে উঠে।

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশীয় চন্দ্র বংশীয় বিজয় সেন, মদন পাল দেবকে বিতাড়িত করে গৌড়ে সেন বংশের সূচনা করেন। সেন রাজত্বকালে পাল বংশীয় রাজাদের শাসন কাঠামো অপরিবর্তিত ছিল। তবে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সীমানা অনেক বৃদ্ধি পায়। বিশ শতকের পূর্ববর্তী রাজশাহী, ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ এবং সম্ভবত বর্তমানকালের চট্টগ্রাম বিভাগের কতক অংশ এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল[১৯]। রাজশাহী জেলায় সেন বংশের পুরাকীর্তির মধ্যে সি.টি. মেটকাফ (C.T. Metcalf) কর্তৃক ১৮৬৫ সালে আবিষ্কৃত দেওপাড়া শিলা লিপি সেন বংশের বিশেষ করে বিজয় সেনের রাজত্বকালের স্বাক্ষর বহন করে[২০]। সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূত্রপাত করেন ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী। বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী বাংলার উত্তর অংশের আর একটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে বরেন্দ্রী মণ্ডল গঙ্গা ও করতোয়া নদের মধ্যে অবস্থিত বলে বর্ণিত হয়েছে[২১]। এ বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির একটি বৃহৎ মণ্ডল বা প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে গণ্য এবং তাকে প্রাচীন পুণ্ড্রের সাথে অভিন্ন বলে মনে করা হয়[২২]। এ বরেন্দ্রী ভূ-খণ্ডই মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট বরিন্দ নামে সুপরিচিত। এ পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী-বরিন্দের দক্ষিণাংশের সীমান্তস্থিত ভূমি ভাগই রাজশাহী জেলা।[২৩]

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী লক্ষ্ণৌতী ও দেওকোটে[২৪] তাঁর বিজিত অঞ্চলের জন্য রাজধানী স্থাপন করেন এবং এখান থেকেই সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলকে জয় করেছিলেন। তিনি তাঁর বিজিত অঞ্চলকে কতগুলো ইক্‌তা বা প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেন। এর মধ্যে 'মাসিদাসন্তোষ' এবং 'নারকুটী' উল্লেখযোগ্য। 'মাসিদাসন্তোষ' রাজশাহী জেলার 'মাহিসন্তোষ' এবং নারকুটী'কে শাব্দিক মিলের কারণে 'নাটারী' বা বর্তমান 'নাটোর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে[২৫]। লক্ষ্ণৌতী বিজয়ের পর প্রায় শত বৎসর ধরে বাংলা দিল্লীর সুলতানদের অধীন ছিল। সেই সময় এ দেশ কখনও স্বাধীন আবার কখনও দিল্লীর অধীন ছিল। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭) প্রথম বাংলার স্বাধীনতা আনয়ন করেন এবং রাজধানী পাণ্ডুয়াতে স্থানান্তর করেন।

ইলিয়াস শাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ১৪১৪ সাল পর্যন্ত গৌরবের সঙ্গে বাংলা শাসন করেন। এ

বংশের রাজত্বের শেষের দিকে ভাতুড়িয়ার হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ শাসককে হত্যা করে বাংলার ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করেন। পরবর্তীতে তাঁর বংশধররা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ১৪৩৩ সাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে। একই বৎসরে পুনরায় বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৪৮৬ সাল পর্যন্ত কৃতিত্বের সাথে বাংলা শাসন করে।

পরবর্তীতে ইলিয়াস শাহী বংশের শেষের দিকে হাবসী ক্রীতদাসরা ক্ষমতাশালী ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠে এবং বাংলার সিংহাসন দখল করে। তবে তাদের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উজীর সৈয়দ হোসেনের নেতৃত্বে আমীরদের বিদ্রোহের ফলে ১৪৯৩ সাল থেকে বাংলায় হোসেন শাহী বংশের সূচনা হয়।

হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ শাহ ১৫৩৮ সালে বিহারের আফগান শাসনকর্তা শেরশাহ সুর কর্তৃক পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হলে হোসেন শাহী বংশের অবসান ঘটে। শেরশাহ ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বকালে বাংলা দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৫৩৯-৫৩)। দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে আফগানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের কারণে মুহাম্মদ খান সুর বাংলায় স্বাধীন সুর আফগান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার বংশধরগণ ১৫৬৪ সাল পর্যন্ত শাসন করে। এরপর তাজ খান ১৫৬৪ সালে গিয়াসউদ্দিন নামক ব্যক্তিকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলা জয়ের মাধ্যমে কররানী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫২৬ সালে সম্রাট বাবর কর্তৃক দিল্লিতে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোঘল শাসনামলে সম্রাট আকবর বাংলার সুলতান দাউদ শাহ কররানীর বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে তাঁকে রাজমহলের যুদ্ধে (১৫৭৬) পরাজিত ও হত্যা করেন। এভাবে বাংলা অধিকৃত হলেও শুধু উত্তর পশ্চিম বাংলায় মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র মোঘল সাম্রাজ্যকে যে কয়টি সুবায় বা প্রদেশে বিভক্ত করেন তার মধ্যে বাংলা মোঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম সুবা বা প্রদেশ ছিল[২৬]।

১৫৮০ সালে রাজা টোডরমল বাংলার রাজস্ব আদায়ে শৃঙ্খলা ও আয় বৃদ্ধির জন্য বাংলাকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগনায় বিভক্ত করেন। ১৯টি সরকারের মধ্যে ৬টি সরকারের কয়েকটি পরগনা নিয়ে বর্তমান পুনর্গঠিত রাজশাহী জেলার আয়তন ধরা হয়।[২৭]

মুসলিম যুগে বাংলায় জমিদার শ্রেণি ছিল। এসব জমিদারী গড়ে উঠেছিল মূলত তৎকালীন শাসকদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কর প্রদান সাপেক্ষে ও ইজারাদার[২৮] পদ্ধতির দ্বারা। মোঘল আমলে বিশেষ করে সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার বিভিন্ন এলাকায় অনেক জমিদার ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব পুনর্গঠনের কারণে জমিদারদের উত্থান ঘটে।[২৯]

রাজশাহী জেলার জমিদারীগুলোর মধ্যে তাহিরপুর ও সাঁতুল জমিদারী প্রাচীন। এই জমিদারদ্বয় ভৌমিক ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে নাটোর, দুবলহাটি, দিঘাপতিয়া, পুঠিয়া, বলিহার, তালন্দ, মহাদেবপুর, কানসার্ট জমিদারী উল্লেখযোগ্য। হিন্দু জমিদার ছাড়াও অনেক মুসলমান জায়গীরদার ও জমিদার ছিলেন। লস্করপুর পরগনা (পরে পুঠিয়া

জমিদারী), কাশিমপুর পরগনা (কাশিমপুর জমিদারী), তাহিরপুর পরগনা (তাহিরপুর জমিদারী), তারটিয়ার জমিদারী, বাঘার জায়গীর উল্লেখযোগ্য ছিল।

এ সকল স্থানীয় জমিদারগণ নিজ নিজ অঞ্চলের শাসন শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারকে রাজস্ব প্রদান করতেন। যারা ঠিকমত রাজস্ব প্রদান করতে পারতেন না বা বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন তাদেরকে হাজতবাস করতে হতো নয়তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়ে অন্যের সাথে নতুন বন্দোবস্ত হতো। বিখ্যাত নাটোর জমিদারী ও দিঘাপতিয়ার জমিদারী মুর্শিদ কুলী খানের সময় এভাবে গড়ে উঠেছিল[৩০]। মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব অর্থনৈতিক ও রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৭০৭ সালে মুর্শিদ কুলী খানকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ১৭১৩ সালে সম্রাট ফারুখ শিয়ার তাঁকে বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রথমে রাজমহল এবং পরে ঢাকা সুবাদারদের শাসনকেন্দ্র ছিল। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী শহরের মর্যাদা লাভ করে। নবাব মুর্শিদ কুলী খান এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং নিজ নামানুসারে মুর্শিদাবাদ নামকরণ করেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সুবে বাংলাকে ১৩টি চাকলায় এবং ১৬৬০টি মহালে বিভক্ত করেন[৩১]। তন্মধ্যে 'রাজশাহী চাকলা' নামে একটি সুবিস্তৃত এলাকা নির্ধারিত হয়। তবে এ চাকলার সাথে বর্তমান রাজশাহী জেলার কোনো মিল নেই[৩২]। এ চাকলা এতই বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে এর পশ্চিম সীমা ভাগলপুর এবং পূর্ব সীমা ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ চাকলা আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পদ্মা নদীর দক্ষিণের অংশ 'নিজ চাকলা রাজশাহী' এবং উত্তর অংশ 'উত্তর চাকলা' নামে অভিহিত হতো।[৩৩]

এ বিশাল 'রাজশাহী চাকলার' রাজস্ব আদায় করতেন উদিত নারায়ণ নামে একজন জমিদার। তিনি মুর্শিদাবাদ-এর বড় নগরের নিকট বিনোদলালা নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন[৩৪]। বর্তমান সাঁওতাল পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং রাজশাহী বিভাগের বগুড়া, পাবনা, মালদহ প্রভৃতি জেলা তাঁর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার শাসিত 'রাজশাহী চাকলা' রাজশাহী নামে পরিচিত ছিল[৩৫]। কিন্তু উদিত নারায়ণ ১৭১৩ সালে সরকারি খাস জমির রাজস্ব পরিশোধ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। তাঁকে দমন করতে মুর্শিদ কুলী খাঁ অগ্রসর হলে ভয়ে উদিত নারায়ণ আত্মহত্যা করেন। পরবর্তীতে মুর্শিদ কুলী খাঁ এই বিশাল রাজশাহীর জমিদারি দেওয়ান রঘুনন্দনকে প্রদান করেন।[৩৬] রাজশাহী জমিদারি রঘুনন্দন তাঁর ভাই রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত নেন।[৩৭] এভাবে যে নতুন জমিদারীর সৃষ্টি হয় তা রাজশাহীর ইতিহাস খ্যাত নাটোর জমিদারি।

এ জমিদারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে।[৩৮] সে সময় তাহিরপুর ও লস্করপুর পরগনা ব্যতীত মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, পাবনা, মালদহ, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোহর, সাঁতুল ও ভাগলপুর পরগনাসহ ১৩৯টি পরগনা জুড়ে রামজীবনের জমিদারী বিস্তৃত ছিল।[৩৯] এর মধ্যে রাজশাহীর প্রাধান্যতার কারণে এ জমিদারি 'রাজশাহী জমিদারী' নামে পরিচিত।[৪০] রামজীবন (১৭০৪-১৭৩০) দিল্লীর বাদশাহ-এর নিকট থেকে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন। রামজীবনের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তকপুত্র

রামকান্ত (১৭৮৪) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নাটোরের জমিদার ছিলেন। এরপরে রামকান্তের বিধবা পত্নী রাণী ভবানী রাজশাহী জমিদারির কর্তৃত্ব পান।[৪১] রাণী ভবানীর সময় এই জমিদারির আয়তন আরো বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদ কুলী খাঁন বাংলাকে যে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেছিলেন তার মধ্যে ৮টি চাকলা রাণী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪২]

অষ্টাদশ শতকে বাংলার ইতিহাসে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ১৬০০ সালে ভারত উপমহাদেশে আগমন করে। ক্রমে ক্রমে তারা শক্তিশালী হয়ে বাংলার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে এবং নবাব আলীবর্দী খাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে দেশীয় চক্রান্তকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়। এ চক্রান্তের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৭৫৭ সালে সংঘটিত পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পরাজয় এবং চক্রান্তকারীদের বিজয়ের দ্বারা। এ বিজয়ের ফলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার শাসন ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী হয়। তবে কোম্পানী নাম মাত্র নবাব নিযুক্ত করার রীতি বহাল রাখে। ১৭৬৫ সালে মোঘল সম্রাট শাহ আলম কোম্পানী সরকারকে দেওয়ানী প্রদান করলে রাজশাহী জমিদারীর রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানীর হাতে চলে যায়।[৪৩]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আইন শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং প্রশাসন ও বিচার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত করার উদ্যোগ নেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম সারাদেশকে ১৯টি জেলায় বিভক্ত করে[৪৪]। তন্মধ্যে রাজশাহী জমিদারী থেকে রাজশাহী জেলার সৃষ্টি হয়[৪৫]।

জেলা সৃষ্টির পর থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বাংলার সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ জেলা ছিল। এসময় পশ্চিমে ভাগলপুর থেকে পূর্বে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া গঙ্গা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত 'নিজ চাকলা রাজশাহী'র এক বিরাট এলাকা রাজশাহী জেলার অংশ হিসেবে পরিগণিত ছিল।[৪৬]

আয়তনে বিশাল হওয়ায় শাসনকার্যে অসুবিধা সৃষ্টি হলে ১৭৯৩ সাল থেকে রাজশাহী জেলা থেকে তার দূরবর্তী এলাকা সমূহকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং নতুন জেলার সৃষ্টি হয়।[৪৭] এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮১৩ সালে রাজশাহী জেলা থেকে রহনপুর ও চাঁপাই থানা দুটিকে দিনাজপুর ও পুর্ণিয়ার সাথে সংযুক্ত করে মালদহ জেলা, ১৮২১ সালে আদমদীঘি, শেরপুর, নওখিলা, বগুড়া, রংপুরের দুটি ও দিনাজপুরের তিনটি থানা নিয়ে বগুড়া জেলা গঠিত হয়। এছাড়াও এর আট বছর পর পুনরায় শাহজাদপুর, মথুরা, খেতুপাড়া, রায়গঞ্জ ও পাবনা এই পাঁচটি থানা রাজশাহী থেকে পৃথক করে সেই সাথে যশোরের চারটি থানা নিয়ে পাবনা জেলার সৃষ্টি হয়। এভাবে বাংলার একটি বৃহত্তর জেলা হিসেবে পরিচিত রাজশাহী জেলার আয়তন পর্যায়ক্রমে ছোট হতে থাকে। এ জেলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর ছিল নাটোর। বিখ্যাত নারোদ নদের মুখ বন্ধ হয়ে পানি নিষ্কাশনের অসুবিধার জন্য নাটোর অস্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হলে রাজশাহীর কালেক্টর জে.এ. প্রিন্সল-এর সিদ্ধান্তে ১৮২৫ সালে প্রশাসনিক সদর দপ্তর নাটোর থেকে রামপুর বোয়ালিয়া[৪৮] নামক রাজশাহীর একটি গ্রামে স্থানান্তরিত হয়[৪৯]। তখন থেকেই রাজশাহী জেলার উন্নতি ঘটতে থাকে।

টেবিল-১
বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী জেলার আয়তন

বৎসর	আয়তন
১৭৮৬	১২৯০৯ বর্গমাইল
১৮৭২	২২৩৪ বর্গমাইল
১৮৯৯	২৩৩০ বর্গমাইল
১৮৯৭	২৫৯৮ বর্গমাইল

উৎস: মুহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, রাজশাহী জেলার সীমানা পরিবর্তন, রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ. ৩১।

১৮২৯ সালে নাটোর মহকুমা এবং ১৮৭৭ সালে নওগাঁ মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৮৯৭ সালে দিনাজপুর জেলার মহাদেবপুর থানা এবং বগুড়া জেলার আদমদীঘি ও নবাবগঞ্জ থানার কিছু অংশ রাজশাহী জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নওগাঁ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯০১ সালে রাজশাহী জেলা নাটোর, নওগাঁ ও সদর মহকুমার মোট ১৪টি থানা নিয়ে গঠিত হয়। থানাগুলো ছিল তানোর, গোদাগাড়ি, বোয়ালিয়া, পুঠিয়া, চারঘাট, বাগমারা, মান্দা, মহাদেবপুর, নওগাঁ, পাঁচুপুর, সিংড়া, নাটোর, বুড়িগ্রাম, লালপুর[৫০]। বোয়ালিয়া বা সদর, নওগাঁ ও নাটোর মুন্সিফিতে বিভক্ত ছিল। রামপুর বোয়ালিয়া (১৮৭৬) এবং নাটোর (১৮৬৯) মিউনিসিপ্যালিটিতে পরিণত হয়েছিল[৫১]। নিম্নে ১৮৭২-১৯০১ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলার থানার সংখ্যা দেওয়া হলো:

টেবিল-২
১৮৭২-১৯০১ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলার থানার সংখ্যা

বৎসর	সংখ্যা
১৮৭২	১২
১৮৮১	১৩
১৮৯১	১৩
১৯০১	১৪

উৎস: Gait, E.A. *The Proviness at Bengal and Their Feudatories (part-II).* Calcutta, Bengal Secretariat Press 1902, p. 6.

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদের মধ্যে পুণ্ড্র জনপদের অন্তর্গত একটি বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ মুসলমান শাসনামলে বিশেষ করে নবাবী আমলে বিখ্যাত নাটোর জমিদারীর অধিনস্ত হলেও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনামলে তা রাজশাহী জেলায় পরিণত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮৪ সালের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির আওতায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নাটোর ও নওগাঁ স্বতন্ত্র জেলায় উন্নীত হয়। ফলে রাজশাহী জেলার সীমানা আরো সংকুচিত হয়ে পড়ে। তবুও বাংলাদেশের অন্যতম জেলা হিসেবে এ জেলা স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে অনাদিকাল পর্যন্ত।

জনগোষ্ঠী

পশ্চিম বাংলার এক বিরাট অঞ্চল পুরাভূমি। এ পুরাভূমি প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত[৫২]। এ

পুরাভূমির উচ্চ গৈরিক এলাকায় সুবিখ্যাত বরেন্দ্র এলাকা। এখানে প্রাচীনকালের পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্য গড়ে উঠেছিল[৫৩]। রাজশাহী জেলা এ পুরাভূমির অন্তর্গত হওয়ায় বাংলার নিম্নাঞ্চল অপেক্ষা এখানে জনবসতি অনেক পূর্বেই শুরু হয়েছিল[৫৪]।

রাজশাহী জেলার আদি জনগোষ্ঠী ছিল সম্ভবত পুণ্ড্র জাতি। একথা স্বীকৃত যে রাজশাহী জেলা প্রাচীনকালে পুণ্ড্র দেশের অন্তর্গত ছিল। ঐতিহাসিক তথ্যে জানা যায়, পৌণ্ড্রক(পোদ) নামক পার্বত্য জনগোষ্ঠী এখানে বসবাস করতো। আরো জানা যায় এখানে 'পোড়া' নামে এক জাতি ছিল যাদের পেশা ছিল আখের রস জ্বাল দিয়ে বা পুড়িয়ে গুড় তৈরি করা। পরবর্তীতে এরা রেশমের সুতা কাটতো[৫৫]। এ পৌণ্ড্রক বা পোড়া নামানুসারে প্রগৈতিহাসিক যুগে পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্য গড়ে উঠেছিল বলে ধারণা করা যায়।

এ পুণ্ড্র জাতি সম্পর্কে ঐতরেয়-বাহ্মণে বলা হয়েছে এরা আর্যভূমির প্রাচ্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের দস্যু কোম (গোষ্ঠী) গুলির অন্যতম[৫৬]। রমেশ চন্দ্র মজুমদার এবং নীহার রঞ্জন রায় এ জাতি সম্পর্কে বলেন, মানব ধর্মশাস্ত্র মতে পুণ্ড্র জাতি বাত্য বা পতিত ক্ষত্রিয়। কিন্তু মহাভারতের সভাপর্বে পুণ্ড্রজাতি সুজাত বা শুদ্ধজাত ক্ষত্রিয়।[৫৭]

এ পুণ্ড্র জাতি অনার্য ও অদ্রাবিড় ছিল[৫৮]। এ জেলার আদি অধিবাসী হিসেবে পুণ্ড্রর সাথে 'শবর' ও 'পোড' জনগোষ্ঠীর উল্লেখ দেখা যায়। 'শবর' কুলীদ শ্রেণিভুক্ত ছিল এবং হিমালয়ের উত্তরপূর্ব দিক হতে প্রবেশ করে তারা বরেন্দ্রর অধিভুক্ত রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল। 'পোদ' অধিবাসী মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী সময়ের আদি অধিবাসী কোচ কর্তৃক পোদ সম্প্রদায় এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়।[৫৯]

পরবর্তীতে এ অঞ্চলে আর্যদের আগমন ঘটে। বৈদিক যুগে বা খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বা তার পূর্বেই যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার ইত্যাদি উপলক্ষ্যে ক্রমশঃ আর্যগণ এ জনপদে এসেছিল[৬০]। পুণ্ড্র জনগণ প্রথম দিকে আর্যদের আগমন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেও পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে আর্যদের আগমন ঘটে। সম্ভবত বৈদিক যুগের শেষভাগে অথবা এর অল্প কিছুকাল পরেই বাংলায় আর্যদের উপনিবেশ ও আর্য সংস্কৃতি স্থাপিত হয়।[৬১]

অপরদিকে এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী লিখেছেন, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে তারা ভারতে প্রবেশ করলেও খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা ষষ্ঠ শতকে তারা বাংলায় প্রবেশ করে। তবে মিথিলা বা উত্তর বিহারের সাথে বরেন্দ্রের ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকার কারণে বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের চেয়ে বরেন্দ্রে অবস্থিত রাজশাহী জেলায় আর্যদের আগমন প্রারম্ভিক সময়ে হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তীকালের হিন্দু ব্রাহ্মণগণ তাদেরকে আর্যদের উত্তর পুরুষ হিসেবে গণ্য করে।[৬২]

এ অঞ্চলের প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত রাজশাহী জেলা গুপ্ত শাসনের অধীন ছিল। এ সময় জৈন ও ব্রাহ্মণ্যবাদ এ অঞ্চলের প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬৩]

পঞ্চম শতক থেকে শুরু করে সপ্তম শতকের মধ্যে লেখা চীনা বিবরণগুলো এবং

পরবর্তীকালে পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, সীতাকোট প্রভৃতি স্থানে নির্মিত বৌদ্ধবিহার, সঙ্ঘারাম দেখে বুঝা যায় যে, তাম্রলিপি, কর্ণসুবর্ণ, পৌণ্ড্রবর্ধন এবং কতকগুলো অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম যথেষ্ট প্রবল ছিল।[৬৪]

দ্বাদশ শতাব্দীতে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজাদের আমলে বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তি ঘটায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম প্রবল হয়ে উঠে। বল্লাল সেন সমাজে কৌলীন্য প্রথা প্রচলন করেন। ফলে নিম্ন শ্রেণির হিন্দুগণ এবং আদিবাসিরা উচ্চ শ্রেণির হিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্যাতিত হতে থাকে। তাই ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম বিজয়কে এ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণির লোকেরা মঙ্গল বলে মনে করেছিল।[৬৫]

মীনহাজ-ই-সিরাজে'র বর্ণনা মতে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে কোচ, মেচ, থারু নামে তিনটি সম্প্রদায় এ অঞ্চলে বাস করতো[৬৬]। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের পর মেচ ও কোচ জনগোষ্ঠীর লোক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। আলীমেচ ও তাঁর সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাংলায় মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে মুসলমানগণ প্রধান হয়ে উঠে। ঊনবিংশ শতকে রাজশাহী জেলায় মুসলমান জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৮৭২-১৯০১ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলার মোট জনসংখ্যা ও সূচক সংখ্যা এবং হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা ও সূচক সংখ্যা দেয়া হলঃ

টেবিল নং-৩

১৮৭২-১৯০১ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলার মোট জনসংখ্যা ও সূচক

সাল	মোট জনসংখ্যা	সূচক সংখ্যা	মুসলমান জনসংখ্যা	সূচক সংখ্যা	হিন্দু জনসংখ্যা	সূচক সংখ্যা
১৮৭২	১৩১০৭২৯	১০০.০০	১০১৭৯৭৯	১০০.০০	২৮৬৮৭১	১০০.০০
১৮৮১	১৩৩৮৬৩৮	১০২.১২	১০৪৯৭০০	১০৩.১১	২৮৮৭৪৯	১০০.৬৫
১৮৯১	১৩১৩৩৩৬	১০০.১৯	১০৩৩৯২৭	১০১.৫৬	২৭৮৯৩৮	৯৭.২৩
১৯০১	১৪৬২৪০৭	১১১.৫৭	১১৩৫২০২	১১১.৫১	৩২৬১১১	১১৩.৬৭

উৎসঃ **Beverley, H.** *Report on the Census of Bengal, 1872,* Calcutta Bengal Sceretariat Press 1872, pp. VI-VII.

Bourdillon, J.A. *Report on the Census of Bengal, 1881* Vol. 1, Calcutta : Bengal Secretariat Press-1883. pp. 38A, 285.

O'Donnell, C.J. *Census of India, 1891. vol-IV,* Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1893, pp. 36, 37

Rajshahi District Gazetteer, Statistics, 1901-02, Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot. 1905, pp. 3, 4

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার সারণীতে ১৮৭২ সালকে স্থির ভিত্তি বছর ধরে মোট জনসংখ্যা, মুসলমান ও

হিন্দু জনগণের সূচক সংখ্যা নির্ণয় করে দেখা যায় যে, ১৯০১ সালে মোট জনসংখ্যার ১১১.৫৭জন মুসলমান এবং ১১১.৫১জন হিন্দু বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ ছিল ১৮৯৭ সালে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় এ জেলায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়নি। জনগণের মৃত্যুর হার কমে যায় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পায়।[৬৭]

এ অঞ্চলের জনগণের আদি ধর্ম ইসলাম ছিল না। প্রধানত দুইভাবে ইসলামের আগমন ঘটেছে। বহিরাগত, আক্রমণকারী, বিজয়ী মুসলমানদের ধর্ম হিসেবে এবং সুফী, দরবেশ, পীর, আউলিয়া প্রমুখ মরমী সাধক ধর্ম প্রচারকদের ধর্ম প্রচারের সুবাদে। মুসলিম বিজয়ের পর এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও শুদ্র বর্ণের লোকেরা ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতাপে অতিষ্ঠ ও অত্যাচারিত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুলতানী ও মোঘল আমলে আগত ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে হযরত শাহ মৌওলানা দানিশ মন্দ (বাঘা), হযরত শাহ নিয়ামতুল্লাহ (নবাবগঞ্জ), হযরত শাহ মুখদুম রূপোশ (রাজশাহী) প্রভৃতি দরবেশগণ বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা শেষ জীবন পর্যন্ত এখানেই থাকেন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন। তাঁদের বংশধরগণ এখানেই বসবাস করতে থাকেন।[৬৮]

রাজশাহী জেলায় মুসলমানদের মধ্যে সুন্নী মতের অনুসারীদের সংখ্যা বেশি। শিয়াদের সংখ্যা খুবই কম এবং প্রধানত শহরেই বাস করে। এল.এস.এস.ওমেলী-র বর্ণনায় জানা যায় যে, শিক্ষিত মুসলমানরা হানাফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিল[৬৯]। এ অঞ্চলের মুসলমানদের সাধারণত দুভাগে ভাগ করা যায়। একশ্রেণির মুসলমান কোরানের প্রকৃত ধর্ম পালন করে থাকে। অপর শ্রেণির মুসলমানরা, হিন্দুদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতো। নাটোর, নওগাঁ ও নবাবগঞ্জ মহকুমার দূর মফস্বলে আশ্বিন সংক্রান্তিতে গারসী পুঁজা, মঙ্গলঘট, মাদার পূঁজা, ভোগ দেয়া ইত্যাদি এবং মহররমের চাঁদে গাওয়ারা পূজা প্রচলিত ছিল।

প্রথম শ্রেণির মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমানগণ পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত। কৃষক, বারমাসিয়া, জোলা, নলুয়া, ঢুলী ও বেহারা। মৎস ব্যবসায়ীদের মধ্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা সাধারণত মাহীফোরাস নামে পরিচিত। নিকারী ও জিয়ানী এদের অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমানদের মধ্যে কৃষক শ্রেণিই বেশি ছিল। এ অঞ্চলের কৃষকরা আর্থিক দিক থেকে বেশ ধনী ছিল। এরা কোরানের রীতি-নীতি মেনে চলতো। বারোমাসিয়া যাযাবর শ্রেণির মত। সাধারণত নৌকাতেই জীবন-যাপন করতো। জীবিকা নির্বাহের জন্য মনোহারী দ্রব্যাদি নিয়ে হাটে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত। জোলারা মোটা সুতি কাপড় বুনতো। এরা সংখ্যায় খুব বেশি নয়। নলুয়ারা নলের দড়মা তৈরি করলেও কৃষি কাজও করতো। ঢুলী ও বেহারা শ্রেণি বিবাহে ঢোল বাজিয়ে এবং পালকী বহন করে জীবিকা নির্বাহ করতো।[৭০]

মুসলমানদের মধ্যে শেখ, সৈয়দ, পাঠান, কাজী, খন্দকার, শাহ্ সাহু, মণ্ডল, প্রধান, মীর্জা, মৃধা, মুন্সি, মোল্লা, খাঁ, সরকার, প্রামাণিক, মিয়া প্রভৃতি উপাধির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

নাটোরের খন্দকার বংশের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। সুলতানী শাসনামলে এ বংশের পূর্ব পুরুষ এ অঞ্চলে আগমন করে। কথিত আছে যে, তারা বাগদাদের আব্বাসী শেখ গোত্রভুক্ত এবং খলিফা হারুন-অর-রশীদের বংশধর। খন্দকার মইনুল ইসলাম, খন্দকার বদরুল ইসলাম এবং খন্দকার রফিকুল ইসলাম প্রমুখ এ বংশের পূর্ব পুরুষগণ সমাজে শ্রদ্ধাভাজন, মর্যাদা সম্পন্ন এবং নেতৃস্থানীয় ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। খন্দকার বংশ ছাড়াও নাটোরের পাঠান বংশ অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল।[৭১]

রাজশাহী জেলায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৮টি ভাগ দেখা যায়। যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য, কায়স্থ, নমশুদ্র, জল আচরণীয় হিন্দু এবং জল অনাচরণীয় হিন্দু।[৭২] এ আট শ্রেণির মধ্যে বহু শাখা-প্রশাখা আছে। এরা এ জেলার প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

রাজশাহী জেলার ব্রাহ্মণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা:
১. বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ ২. রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ৩. বৈদিক ব্রাহ্মণ ৪. বর্ণ ব্রাহ্মণ ৫. কনৌজ ব্রাহ্মণ

এদের মধ্যে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই বেশি[৭৩]। ব্রাহ্মণদের আদি পুরুষ ছিলেন কনৌজ থেকে আগত দক্ষ, ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামক পাঁচজন ব্রাহ্মণ। রাজা আদি শুরের সময় তারা এদেশে এসেছিল। এদের বংশধরদের কিছু অংশ রাঢ় দেশে এবং কিছু অংশ বরেন্দ্রভূমে বাস করতো। যারা বরেন্দ্রভূমে বাস করতেন তারা বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণির লোক। রাজশাহী জেলার বিভিন্ন জমিদারগণ যেমন- তাহিরপুর, পুঠিয়া, নাটোর, বলিহার, চৌগ্রাম, তানোর, কাসিমপুর, পানশীপাড়া, জোয়াড়ী, খাজুড়া প্রভৃতি বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন[৭৪]। এ শ্রেণির ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাগচী, ভাদুরী, লাহিড়ী, মৈত্রেয়, স্যানাল প্রভৃতি পদবি দেখা যায়। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ কুলীন, শ্রোত্রীয় এবং কাপ নামক তিনটি শাখায় বিভক্ত[৭৫]। রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণ রাজশাহী জেলার আড়ানী, পাঁকা, কামারগাঁও দমদমা, বান্দাইখাড়া, মহাদেবপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করে। তবে এদের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে কম[৭৬]। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এদেশের আদি নিবাসী নয়। এদের কিছু মহারাষ্ট্র বা মধ্যভারত এবং কিছু অংশ দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছিল[৭৭]। রাজশাহী জেলার জোয়াড়ী, লালুর ও বান্দাইখাড়াতে অল্প কিছু বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস[৭৮]। রাজশাহী জেলায় বর্ণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা খুবই কম। তারা জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চা করে এবং ভাগ্য গণনা করে। পরের দানে জীবন-যাপন করে। কনৌজ ব্রাহ্মণেরা উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিল। এই শ্রেণির ব্রাহ্মণেরা জমিদার, বণিক ও দোকানদার ছিল[৭৯]।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি জাতিবাচক হিন্দু এ জেলায় বাস করে। এসব জাতিবাচক হিন্দুরা আবার তিনভাগে বিভক্ত। বৈদান্তিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক। রাজশাহী জেলার হিন্দুগণ পৌরাণিক মতাবলম্বীরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা আবার পাশাচার ও যোত্যাচারে বিভক্ত। পাশাচার আমিষ ভোজী এবং যোত্যাচার নিরামিষ ভোজী। গীর, ভারতী, ন্যাড়া, বাউল, দরবেশ এ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত যোত্যাচার শ্রেণি[৮০]। ক্ষত্রিয়রা পশ্চিম ভারত থেকে এসেছিল। এরা বনিক ও ব্যবসায় শ্রেণি। রাজশাহী জেলায় এদের সংখ্যা নিতান্তই কম। বৈশ্য জাতি সাধারণত রামপুর-বোয়ালিয়ায় বসবাস করতো। এরা পেশায় ব্যাংকার ও ব্যবসায়ী ছিল।

রাজশাহীর বৈদ্যগণ বঙ্গজ শ্রেণিভুক্ত। বেলঘরিয়া, পুঠিয়া, সরকাঠী প্রভৃতিস্থানে বৈদ্যদের বাস

ছিল। এরা চিকিৎসক শ্রেণি হলেও বর্তমানে খুব কম সংখ্যকই এই পেশায় যুক্ত আছে। অধিকাংশ শিক্ষা সংক্রান্ত পেশার সঙ্গে জড়িত। এদের অনেকেই ভূ-স্বামী, ব্যবসায়ী, লেখক, কেরানি ইত্যাদি[৮১]। কায়স্থ শ্রেণি বিশেষ করে বরেন্দ্র কায়স্থদের প্রধান স্থান হচ্ছে এই রাজশাহী জেলা। দান, নন্দী, চাকী, শর্মা, সিংহ, নাগ, দেব, দত্ত প্রভৃতি উপাধি এরা ব্যবহার করে[৮২]। হিন্দু জাতির মধ্যে কৈবর্ত্যদের সংখ্যাই ছিল বেশি। এরা জল আচরণীয় হিন্দু। কৈবর্ত্য শ্রেণি চাষী কৈবর্ত্য এবং জাইলা কৈবর্ত্য এ দুই ভাগে বিভক্ত। রাজশাহীর উত্তর এবং দক্ষিণ ভাগেই কৈবর্ত্যদের সংখ্যা বেশি[৮৩] ছিল।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি নমশুদ্র। নমশুদ্ররা হাইলা, জাইলা এবং করাতী এ তিন ভাগে বিভক্ত। হাইলারা জমি চাষ করে, জাইলা মাছ ধরে এবং করাতী কাঠ কাটে[৮৪]। এসব শ্রেণি ছাড়াও রাজবংশী, ধোপা, জোলা, কুলু, মুচি প্রভৃতি শুদ্র শ্রেণির লোক এ অঞ্চলে বাস করে[৮৫]। ভর (Bhars), ভুমিজ (Bhumijs), ধাঙ্গর (Dhangars), খবর (Kharwars), কোল (Kols), নাট (Nats), পাহাড়িয়া (Pahariyas) ও সাঁওতাল (Santals) প্রভৃতি আদিবাসি ও পার্বত্য উপজাতিদের এ জেলায় দেখা যায়। বুনা ধাঙ্গর উপজাতির লোকেরা রাজমহল এবং বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের জেলা থেকে এসে রাজশাহী জেলার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত গোদাগাড়ি ও মান্দা থানায় বসতি স্থাপন করে। এরা কৃষি কাজ, মিল ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকের কাজ এবং মাছ ধরতো। চেন (Chains) নামক আদি উপজাতি রাজশাহী জেলায় স্থায়ীভাবে বাস করে। তবে এরা পাশ্ববর্তী রাজমহল থেকে এসেছিল। এরা বাজারে বিক্রয়ের জন্য সবজি উৎপাদন করে। বাগদি (Bagdis) শ্রেণির লোকেরা বীরভূম এবং বাকুঁড়া জেলা থেকে এসেছে। এরা রাস্তা তৈরির কাজ করে[৮৬]।

১৮৮৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের পর সাঁওতাল পরগণা থেকে বিতাড়িত হয়ে সাঁওতালরা এখানে আসে[৮৭]। ১৮৬২ সালে রামপুর বোয়ালিয়ায় মিশনারী চার্চ প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্মের প্রসার ঘটে। সাঁওতাল এবং কিছু উপজাতিকে মিশনারিরা খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে। তবে এ জেলায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কম[৮৮]।

টেবিল-৪

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের শতকরা হার

গণনার বছর	মুসলমান	হিন্দু	খ্রিস্টান	উপজাতি	অন্যান্য
১৮৭২	৭৭.৬৬%	২১.৪৪%	-	-	-
১৮৮১	৭৮.৪২%	২১.৫৭%	১.২১%	-	-
১৮৯১	৭৮.৭৩%	২১.২৪%	১.০৫%	০.২০%	-
১৯০১	৭৭.৬৩%	২২.২৩%	৩.৫১%	১.১%	০.৩%

উৎস: **Bourdillon, J.A.** *Report on the Census of Bengal-1881,* vol. I (Calcutta : Bengal Secretariat Press), 1883, p. 74.

Porter, A.E. *Census of India, 1931,* vol. V (Calcutta : Central Publication Branch), 1933, p. 411.

উপরের পরিসংখ্যান থেকে পরিদৃষ্ট হয় যে, ১৮৮১ সালের তুলনায় ১৯০১ সালে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই তুলনায় উপজাতি ও অন্যান্যদের সংখ্যা অত্যন্ত কম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাও আবার ১৮৯১ এবং ১৯০১ সালের সেনসাস রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত হলে রাজশাহী নিরাপদ স্থান মনে করে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার হাজার হাজার অধিবাসী রাজশাহী জেলার চারঘাট, লালপুর, বোয়ালিয়া, গোদাগাড়ি প্রভৃতি এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে[৮৯]। নওয়াব আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০-১৭৫৬) এ হামলায় অতিষ্ট হয়ে আত্মীয় পরিজনসহ গোদাগাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্বল্পকালের মধ্যে এখানকার কালীপারই পাড়াকে কেন্দ্র করে সৈন্যগড়, পথ-ঘাট নির্মিত হয়। এ স্থান আজও কেল্লায়ে পারইপাড়া নামে প্রসিদ্ধ[৯০]। বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত এ সকল লোকদের মধ্যে গৃহস্থ, কৃষক, মজুর, ব্যবসায়ী, শিল্পী, জমিদার, জোতদার, উচ্চপদস্থ কর্মচারি প্রভৃতি সকল শ্রেণির লোক ছিল[৯১]।

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদের মধ্যে পুন্ড্র জনপদের অন্তর্গত একট বিস্তীর্ণ ভূভাগ মুসলমান শাসনামলে বিশেষ করে নবাবী আমলে বিখ্যাত নাটোর জমিদারির অধীনস্ত হয়। তবে ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনামলে এ জমিদারী থেকে রাজশাহী জেলার উৎপত্তি ঘটে।

এ জেলার আদি অধিবাসী পুণ্ড্র জনপদের নামানুসারে পুণ্ড্র জাতি নামে পরিচিত। পরবর্তীতে আগত আর্য জাতি এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে এবং হিন্দু বর্ণ প্রথার সৃষ্টি করে। এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বর্ণপ্রথার প্রভাব ছাড়াও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রভাব ছিল। মুসলিম শাসন শুরু হলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এ জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় পরিণত হয়। মুসলমান ও হিন্দু শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোকদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি আদিবাসিরাও এ অঞ্চলে বসবাস করে। মোটকথা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সহাবস্থান এ জেলাকে সমসাময়িক বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় আলাদা মর্যাদা দান করেছে।

তথ্যসূচিঃ

---

১ Dey Nundolal, *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval, India,* (New Delhi, Oriental Books reprient Corporation 3rd edition 1971), p. 161

২ মদন মোহন কুমার (সম্পাদিত), *ভারত কোষ, পঞ্চম খণ্ড* (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৩), পৃ. ৪১৫

৩ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২), পৃ. ৩

৪ কালীনাথ চৌধুরী, *রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, (কলিকাতা: স্কুল বুক প্রেস, ১৯০১), পৃ. ১৫

৫ এ. কে.এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
৬ মুস্তফা নুর উল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ: বাঙালীর আত্মপরিচয়ের সন্ধানে*, (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ. ২০
৭ মনসুর মুসা (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ*, (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪), পৃ. ৬৩
৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
৯ অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৫৯
১০ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পরিবর্তিত পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৭৭ বং), পৃ. ১২, ৩৩-৩৪
১১ ছয়খানি তাম্র লিপি এর মধ্যে ৫টি দামোদরপুর তাম্র শাসন এবং ১টি পাহাড়পুর তাম্র লিপি। Chowdhury, Abdul Momin, Geography of Ancient Bengal: The Pundravardhana Bhukti, *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XXII, No. 3, (Dacca, 1977), pp. 183-184
১২ হরগোপাল দাস কুণ্ডু, *পৌণ্ড্রবর্ধন ও করতোয়া (প্রাচীন বাংলার উজ্জ্বল চরিত্র)*, (শেরপুর: টাউন ক্লাব, ১৩২৬), পৃ. ৩৩
১৩ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়ের কথা*, (কলিকাতা: সাহিত্যলোক, ১৩৯০), পৃ. ২৮
১৪ মুস্তফা নুর-উল-ইসলাম (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
১৫ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
১৬ অজয় রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩
১৭ নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬
১৮ কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস ২য় খণ্ড* (বগুড়া: কাজী প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃ. ২১৯
১৯ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১
২০ Majumder, Nani Gopal (Edited with translation and notes), *Inscription of Bengal*, vol. III, (Rajshahi : Varendra Research Society, 1929), p. 43.
২১ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭
২২ এ. কে.এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩
২৩ কাজী মোহাম্মদ মিছের, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬
২৪ ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বিজিত রাজ্যকে শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন। বাগড়ীর কিছু অংশ ও বরেন্দ্র ভূমি নিয়ে এক ভাগ-এর রাজধানী দেবীকোট বা দেবকোট বা দেওকোট (বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুর) এবং রাঢ় মিথিলার কিয়দংশ নিয়ে অন্যভাগ-লখনৌতিতে এর রাজধানী স্থাপিত হয়। কাজী মোহাম্মদ মিছের, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩
২৫ এ. কে.এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
২৬ এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (২য় খণ্ড)*, (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত), (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ. ৬০
২৭ এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪, ২৫৭
২৮ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকার কর্তৃত্ব অর্জন করাকে ইজারাদার পদ্ধতি বলে।
২৯ এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩
৩০ Karim, Abdul, *Murshid Quli Khan and his times*, (Dacca : The Asiatic Society of Pakistan, 1963), p. 88
৩১ কয়েকটি পরগনা সমষ্টি বা একীভূত জেলা হল চাকলা। এটি একটি রাজস্ব ইউনিট ছিল।
৩২ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৩৩ মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, *ইংরেজ আমলে রাজশাহী* (রাজশাহী এসোসিয়েশন সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম

সংখ্যা, ১৯৮৭), পৃ. ৩৪

৩৪ সমর পাল, নাটোরের ইতিহাস, (ঢাকা: পদাতিক প্রকাশনী, ১৯৮০), পৃ. ৭-৮

৩৫ কালীনাথ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

৩৬ বিমলাচরণ মৈত্রেয়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮

৩৭ এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩

৩৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭২।

৩৯ কাজী মোহাম্মদ মিছের, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩

৪০ এম.এ. হামিদ, *চলন বিলের ইতিকথা*, (পাবনা: আমাদের দেশ প্রকাশনী, ১৯৬৭), পৃ. ২৬৬

৪১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪

৪২ মোঃ মকছুদুর রহমান, *নাটোরের রাণী ভবানী*, (রাজশাহী: হোসনে আরা রহমান, ১৯৮৮) পৃ. ৪

৪৩ সমর পাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

৪৪ সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো (১৭৫৭-১৮৫৭)*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ১৭৩-১৭৪

৪৫ বিমলাচরণ মৈত্রেয়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১-৩০২

৪৬ Hunter, W.W., *A Statistical Account of Bengal, volume-8*, (London : Tubner and Company, 1876), p. 20

৪৭ Hunter, W.W. *Op., Cit*., pp. 20-21

৪৮ রাজশাহী জেলার প্রধান নগর রাজশাহী পূর্বে রামপুর বোয়ালিয়া নামে পরিচিত ছিল। এটা পদ্মা নদীর উত্তরে অবস্থিত। জেলার সদর দপ্তর হিসেবে রাজশাহী নামেই বেশি পরিচিত। বিমলাচরণ মৈত্রেয়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬

৪৯ মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, (ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৬), পৃ. ৩৪

৫০ *Bengal District Gazetteer, B., vol. Rajshahi District Statistics 1900-1901 To 1910-1911, Quarterly*, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot., 1913), p. 2

৫১ *Quartly Civil List for Bengal, No. CXXXIV, 1900*. (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1900), p. 308

৫২ অজয় রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

৫৩ মুস্তফা নুর-উল-ইসলাম (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

৫৪ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

৫৫ আবুল কালাম শেখ নুর মোহাম্মদ, নবাবগঞ্জ পরিচিতি, (রাজশাহী: রাজশাহী জেলা কাউন্সিল, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১২

৫৬ নীহার রঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬

৫৭ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪;

৫৮ এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৫৯ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-১৭

৬০ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

৬১ এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

৬২ এ. কে.এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

৬৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

৬৪ মুস্তফা নুর-উল-ইসলাম (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫১

৬৫ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

৬৬ মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তাবাকাত-ই-নাসিরী*, (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত),

ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩, পৃ. ৩১০

৬৭ O'Malley, L.S.S. *Bengal District Gazetteers Rajshahi*, (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot., 1916), p. 49

৬৮ কাজী মোহাম্মদ মিছের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪

৬৯ Siddiqui, Ashraf (Ed), *Bangladesh District Gazetteers Rajshahi*, (Dacca : Bangladesh Government Press, 1976), p. 53

৭০ কালীনাথ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৭১ কাজী মোহাম্মদ মিছের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪

৭২ কালীনাথ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

৭৩ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

৭৪ কালীনাথ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-১৭

৭৫ O'Malley, L.S.S. *Op., Cit*., pp. 56-57

৭৬ বিমলাচরণ মৈত্রেয়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

৭৭ Hunter, W.W. *Op., Cit.*, p. 42

৭৮ কালীনাথ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৭৯ Hunter, W.W. *Op., Cit.*, pp.42-43

৮০ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

৮১ Hunter,W.W. *Op., Cit*., p. 43

৮২ কালীনাথ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৮৩ *Bangladesh District Gazetteers Rajshahi*, *Op., Cit*., p. 58

৮৪ O'Malley, L.S.S. *Op., Cit*., p. 59

৮৫ *Bangladesh District Gazetteers Rajshahi*, *Op., Cit*., p. 58

৮৬ Hunter, W.W. *Op., Cit.*, p. 40

৮৭ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৮৮ *Bangladesh District Gazetters Rajshahi*, *Op., Cit.*, p. 59

৮৯ Census of 1931, *Opcit*., pp. 411-412

৯০ কাজী মোহাম্মদ মিছের, (২য় খণ্ড), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২, ১৬৩

৯১ *Bangladesh District Gazetters Rajshahi*, *Op., Cit.*, p. 34.